শহীদ বিপুল-সুনীল-লিটন-রুহিনের সম্মানে আয়োজিত স্মরণ সভায় ইউপিডিএফের সাধারণ সম্পাদকের লিখিত বক্তব্য

২০ ডিসেম্বর ২০২৩

শহীদ বিপুল চাকমা, শহীদ সুনীল ত্রিপুরা, শহীদ লিটন চাকমা ও শহীদ রুহিন বিকাশ ত্রিপুরার সম্মানে আয়োজিত আজকের স্মরণ সভার

সংগ্রামী সভাপতি,

উপস্থিত পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম নারী সংঘের বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ;

ঢাকা ও চট্টগ্রাম থেকে আগত বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ;

পানছড়ির নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিবৃন্দ;

শহীদ চার নেতার পরিবারের সদস্যবৃন্দ;

সমবেত এলাকাবাসী;

সুধীবৃন্দ –

আমি আপনাদের সবাইকে আমাদের পার্টি ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে সংগ্রামী শুভেচ্ছা ও বিপ্লবী অভিবাদন জানাচ্ছি।

(১)

আপনারা জানেন, গত ১১ ডিসেম্বর রাতে একটি বিশেষ রাষ্ট্রীয় বাহিনীর লেলিয়ে দেয়া ঠ্যাঙাড়ে সন্ত্রাসীরা পানছড়ির অনিলপাড়ায় বিপুল, সুনীল, লিটন ও রুহিনকে ঠাণ্ডা মাথায় নৃশংসভাবে খুন করে। এই বর্বর ও পৈশাচিক হত্যাযজ্ঞ পার্বত্য চট্টগ্রাম তো বটে, পুরো দেশকে স্তম্ভিত করেছে। এর বিরুদ্ধে এখনো নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় বয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠন বিবৃতি দিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে। মানবাধিকার সংগঠনগুলো হত্যাকারীদের বিচারের মুখোমুখি করার দাবি জানাচ্ছে। ভারতের একটি সংগঠন হামলার সাথে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগে চার সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ভিসা নিষেধাজ্ঞা দেয়ার জন্য জাতিসংঘ ও আমেরিকার কাছে আবেদন জানিয়েছে। যার সামান্যতম মনুষ্যত্বের মূল্যবোধ আছে সে কখনই এই বর্বরতম নরহত্যাকে সমর্থন করতে পারে না।

কিন্তু কেন এই হত্যা? কেন বাছাই করে বিপুল, সুনীল, লিটন ও রুহিনকে খুন করা হলো? কী তাদের অপরাধ? জাতি হিসেবে বেঁচে থাকতে হলে আজ আমাদের এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে হবে।

(২)

বিপুল, সুনীল, লিটন ও রুহিন কেবল ব্যক্তি নয়। তারা একটি নির্দিষ্ট ধারার রাজনীতির চর্চা করতেন। একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত ছিলেন। একটি নির্দিষ্ট নীতি ও আদর্শের প্রতিনিধিত্ব করতেন। তারা পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের নিপীড়িত জাতি ও জনগণের মুক্তির জন্য লড়াই করেছিলেন। তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুঁখে দাঁড়িয়েছিলেন। এজন্য তাদেরকে মূল্য দিতে হয়েছে, নিপীড়ন-নিগ্রহ ও জেল-জুলুমের শিকার হতে হয়েছে।

বিপুল চাকমাকে ২০১৬ সালে পুলিশ গ্রেফতার করেছিল। সেদিন তিনি তার ক্যান্সার আক্রান্ত মাকে জরুরী চিকিৎসার জন্য খাগড়াছড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিলেন। গ্রেফতারের সময় তার মৃত্যু-পথযাত্রী মায়ের সামনে তাকে যেভাবে লাঞ্ছনা , রূঢ় ও অমানবিক আচরণ করা হয় তা সভ্য সমাজের জন্য সত্যি কলংকজনক। তিনি জেলে থাকার সময় তার মা মারা যান, হাতকড়া পরা অবস্থায় মাকে শেষ বারের জন্য দেখতে যাওয়ার দৃশ্য ভুলবার নয়।

সুনীল ত্রিপুরাকেও জেলে যেতে হয়েছিল। তাকে ২০১৮ সালে ঢাকার অনতিদূরে সাভার থেকে গ্রেফতার করা হয়। তার বিরুদ্ধে কোন গ্রেফতারী পরোয়ানা ছিল না। দুই বছরের অধিক সময় বিনা অপরাধে তাকে জেল খাটতে হয়।

কিন্তু এসব মিথ্যা মামলা, জেল-জুলুম তাদেরকে দমাতে পারেনি। এতে বরং তাদের সংগ্রামী বিপ্লবী চেতনা আরও বেশি শাণিত হয়, আদর্শের প্রতি অনুরক্তি আরও বেড়ে যায় এবং পার্টি ও আন্দোলনের প্রতি অঙ্গীকার আরও বেশি সুদৃঢ় হয়। তাই তারা জেল থেকে ছাড়া পাওয়া মাত্রই আবার সংগঠনের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেন।

অন্যদিকে লিটন ও রুহিন ছিলেন পার্টির আদর্শে ও সংগ্রামে অবিচল। একনিষ্ঠতা ও বিশ্বস্ততার সাথে তারা তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতেন। লিটন ২০০৯ সালে প্রথম পিসিপির সাথে জড়িয়ে পড়েন। পরে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামে যোগ দেন। রুহিন ২০১০ সালে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের পানছড়ি ইউনিটের সাথে যুক্ত হন এবং ২০১৪ সালের দিকে পার্টির সদস্যপদ গ্রহণ করেন। তিনি পানছড়ি ও খাগড়াছড়ির বিভিন্ন জায়গায় সাংগঠনিক কাযক্রমের সাথে জড়িত ছিলেন।

(৩)

বিপুল, সুনীল, লিটন ও রুহিন এখন অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করা, হার না মানা প্রতিবাদী তারুণ্যের প্রতীকে পরিণত হয়েছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনীতিতে এখন সুস্পষ্ট দু’টি ধারা বিদ্যমান। একটি হচ্ছে সুবিধাবাদী, আপোষকামী, পরাজয়বাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল ধারা। এরা অধিকারহারা নিপীড়িত জনগণের পক্ষে লড়াই না করে শাসকগোষ্ঠীর সাথে নির্লজ্জভাবে আপোষ করেছে, সরকারের লেজুড়বৃত্তি ও পদলেহন করছে এবং আন্দোলনের পিঠে ছুরিকাঘাত করছে। সে কারণে আপামর জনগণের কাছে তারা নিন্দিত ও ধিকৃত।

অন্য ধারাটি হচ্ছে সংগ্রামী প্রতিবাদী ও বিপ্লবী ধারা। এরা জনগণের ওপর চলা অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে জীবন বাজি রেখে নিরলসভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। চরম প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও তারা এই সংগ্রামে অবিচল রয়েছে।

বলার অপেক্ষা রাখে না, সরকার ও শাসকগোষ্ঠী প্রথমোক্ত ধারাটিকে অর্থাৎ সুবিধাবাদী, আপোষকামী, পরাজয়বাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল ধারাটিকে সব ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে আপোষহীন সংগ্রামী ধারাটির ওপর চালাচ্ছে নিষ্ঠুর দমনপীড়ন। বিপুল, সুনীল, লিটন, রুহিন সংগ্রামী বিপ্লবী ধারাটিরই প্রতিনিধিত্ব করেছেন। আজ যখন অনেক ছাত্র তরুণ অতি সামান্য সুবিধা ও অর্থের প্রলোভনে নিজের বিবেককে কলঙ্কিত করে সুবিধাবাদী ধারায় গা ভাসিয়ে দিচ্ছে, বিপুল-সুনীলরা তা করেননি। তারা সেটাকে মনুষ্যত্ব ও তারুণ্যের জন্য চরম অবমাননাকর, ধিক্কারজনক ও হীন কাজ বলে মনে করতেন। তারা নিপীড়িত জাতি ও জনগণের জন্য কাজ করা এবং জীবন উৎসর্গ করাকে অত্যন্ত সুমহান কাজ বলে মনে করতেন। এমনকি একজন বন্ধু বা কমরেডের জন্য তারা কী ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন তা তাদের শহীদ হওয়ার ঘটনা থেকেও বোঝা যায়। নরাধম ঠ্যাঙাড়েরা বিপুলকে হত্যা করার পর সুনীল ত্রিপুরাকে জীবন্ত ধরে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। এজন্য তারা তার হাত পিছমোড়া করে বেঁধে দেয়। কিন্তু সুনীল দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিলেন, “বিপুলকে তোমরা খুন করেছ, আমার আর বেঁচে থাকার কোন অর্থ নেই। আমি তোমাদের সাথে যাবো না, গুলি করে মেরে ফেললেও আমি যাবো না।” কাপুরুষ, মানুষ নামের কলংক ঠ্যাঙাড়েরা এভাবে সুনীলের বীরত্ব ও সাহসের কাছে পরাজিত হয়। আর সুনীল মরেও অমর হয়ে যায়।

(৪)

বিপুলদের হত্যার পর ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী ও তাদের মদদদাতাদের বিরুদ্ধে সর্বত্র নিন্দা ও ধিক্কার উচ্চারিত হচ্ছে। অনেকে প্রতিশোধ নেয়ার প্রবল ইচ্ছাও ব্যক্ত করছে। এটাই স্বাভাবিক এবং তা আমাদের মধ্যে আশাবাদ শতগুণ বাড়িয়ে দেয়। যে নিপীড়িত জাতি ও জনগণ তার শত্রুর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে না, সে জাতি ও জনগণ তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে না, আর সংগ্রাম করে না বলে তারা অধিকার অর্জন করতে পারে না, বিজয় অর্জন করতে পারে না। যে কৃষক ধান গাছের চারা ও আগাছা পার্থক্য করতে পারে না, ধানের চারাকে রক্ষা করতে আগাছাকে উপড়ে ফেলে না, সে কৃষক কখনই গোলায় ধান তুলতে পারে না এবং ফলে তাকে উপোষে মারা যেতে হয়।

রাজনৈতিক আন্দোলনেও জনগণকে চিনতে হয় কে তার জন্য লড়াই করছে, আর কে তার বিরুদ্ধে কাজ করছে। তাকে জানতে হবে কাকে রক্ষা করতে হবে, আর কাকে উপড়ে ফেলতে হবে। এটা হলো প্রাথমিক কাজ, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়। তাকে অবশ্যই জনগণের স্বার্থের পাহারাদারদের পক্ষে দাঁড়াতে হবে এবং তাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করতে হবে।

কেউ কেউ এই বলে হা-হুতাশ করে যে, পাহাড়িরা এখন বহু দলে বিভক্ত এবং তাদের মধ্যে প্রায়শ হানাহানি ও সংঘাত চলে, ফলে শাসকগোষ্ঠী এর সুবিধা নিতে সক্ষম হয়। জনগণের মধ্যেকার এই বিলাপবাদীরা আন্তরিকভাবে ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা করেন এবং অনেক সময় ঐক্যবিরোধীদের বিরুদ্ধে ক্রোধ বিষোদ্গারও প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু তারা বুঝতে পারেন না যে, কেবল ঐক্যের আকাঙ্ক্ষা করলেই ঐক্য আসে না, ঐক্যের জন্য সংগ্রাম করতে হয়। তারা ঐক্য চান, কিন্তু তার জন্য সংগ্রাম করেন না।

(৫)

এটা ঠিক বর্তমানে দালাল প্রতিক্রিয়াশীলদের দৌরাত্ম্য বেড়েছে। ঠ্যাঙাড়ে সন্ত্রাস সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে। কিন্তু তাদের এই প্রতাপ চিরস্থায়ী নয়। নাটক সিনেমায় ভিলেনের জন্যও দৃশ্য বরাদ্দ থাকে। থাকে তাদেরও জয়জয়কার। তখন নায়ককে খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু একটি দৃশ্যেই নাটক বা সিনেমা শেষ হয়ে যায় না। শেষ বেলায় ঠিকই নায়কের আবির্ভাব ঘটে এবং বলদর্পী ভিলেনের চূড়ান্ত পরাজয় হয়। রাজনৈতিক আন্দোলনে এই নায়ক হলো জনগণ, যারা সঠিক আদর্শে গঠিত একটি সুশৃঙ্খল পার্টি দ্বারা পরিচালিত হয়ে সংগ্রাম করে বিজয় অর্জন করেন।

আমরা পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলনের ইতিহাসে অতীতেও অনেক ভিলেন দেখেছি, অনেক ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী দেখেছি, লায়ন বাহিনী, টাইগার বাহিনী, গপ্রক বাহিনী, মুখোশ বাহিনী দেখেছি। তাদের সন্ত্রাস ও জুলুম দেখেছি। কিন্তু নব্বই দশকের তুমুল ছাত্র গণ আন্দোলনের জোয়ারে তারা খরকুটোর মতো ভেসে গিয়েছিল। জনগণের প্রলংকরী উত্থানের ফলে তখন শাসকগোষ্ঠী ঠ্যাঙাড়ে দিয়ে আন্দোলন দমনের নিষ্ঠুর খেলা বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল।

আজ যে ঠ্যাঙাড়ে সন্ত্রাস চলছে, গণজাগরণ সৃষ্টি হলে তারাও ধ্বংস হয়ে যাবে। বসন্তকালে গাছের পাতা ঝরা, আর বৈশেখে কয়েক পশলা বৃষ্টির পরশে আবার নতুন পত্রপল্লবে সুশোভিত হয়ে ওঠা যেমন কেউ রোধ করতে পারে না। জনগণের উত্থান এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের পতন বা ধ্বংসও কেউ ঠেকাতে পারে না। শীতকালে যে লোগাং-পূজগাং-চেঙ্গী নদী মৃতবৎ শুষ্ক হয়ে যায়, বর্ষার প্রবল বর্ষণে তারা ফুলে ফেঁপে প্লাবিত হয়ে সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যায়। নদীর বানের মতো জনগণের উত্থানও সব সময় হয় না। জনগণ একদিনই জেগে ওঠেন এবং যখন জেগে ওঠেন তখন অত্যাচারী শাসকের সাথে তাদের সকল পাওনার হিসেব নিকেশ চুকে নেন। ১৯৯০ সালে বাংলাদেশের জনগণ যখন প্রবল তেজে জেগে উঠেছিলেন, তখন কোন অপশক্তি স্বৈরাচারী এরশাদের পতন ঠেকাতে পারেনি। কোন মন্ত্রণা, কোন কৌশল, কোন চাতুরী তাকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়নি।

১৯৭১ সালে হানাদার পাকিস্তানীরাও এদেশের জনগণের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে দমন করতে চেয়েছিল। রাজাকার-আলবদর-আলশামস দিয়ে ধ্বংসযজ্ঞ ও হত্যালীলা চালিয়েছিল, কিন্তু তা সত্বেও তারা মুক্তিকামী জনগণের বিজয় ঠেকাতে পারেনি। বৃটিশরা ভাগ করে শাসন করার কৌশল প্রয়োগ করেছিল। কংগ্রেসের সকল নেতাকে কারারুদ্ধ করে রেখেছিল, কিন্তু তারপরও তাদের শেষ রক্ষা হয়নি। স্বাধীনতা দিয়ে এই উপমহাদেশ থেকে তাকে পাটতারি গুটাতে হয়েছে।

(৬)

আজকের এই দুঃসহ পরিস্থিতিতে আমাদের কী কর্তব্য তা বিপুল, সুনীল, লিটন, রুহিনরা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। যারা অন্যায় মেনে নিতে পারে না, যারা অধিকার ও আত্মমযাদা নিয়ে বাঁচতে চায়, তাদের এখন একটিই কর্তব্য: তা হলো সংগ্রাম করা। সংগ্রাম ছাড়া আমাদের আর কোন বিকল্প নেই। আমাদের নিষ্ক্রিয়তা, দোদুল্যমানতা আমাদেরকে ধ্বংসের দিকেই নিয়ে যাবে। যখন ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা ও ভালো-মন্দের বিচার ও পক্ষ নেয়ার সময় উপস্থিত হয়, তখন তথাকথিত মধ্যপন্থার কোন জায়গা নেই। আপনাকে হয় সত্য, ন্যায় ও ভালোর পক্ষে দাঁড়াতে হবে, নতুবা মিথ্যা, অন্যায় ও মন্দকে বেছে নিতে হবে। আর কোন অবস্থান না নেয়ার অর্থ হলো চরম সুবিধাবাদীতা, যা মিথ্যা, অন্যায় ও মন্দের পক্ষকেই লাভবান করে। বলার অপেক্ষা রাখে না, বিপুল-সুনীলরা সত্য, ন্যায় ও ভালোর পক্ষে ছিলেন এবং তার জন্য আমরণ লড়াই করে গেছেন।

(৭)

পানছড়ি হলো সংগ্রামী বীরদের ঘাঁটি। শহীদ প্রদীপ লাল, কুসুমপ্রিয়, দেবোত্তম, কাতাং ত্রিপুরা (শহীদ সুনীল ত্রিপুরার ভাই), হৃদয়সহ আরও অনেক শহীদ এই মাটিরই সন্তান। তারাও বিপুল-সুনীলদের মতো দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। এজন্য পানছড়িবাসী বুক ফুলিয়ে গর্ব করতে পারেন। তারা বলতে পারেন বীরদের পূণ্যভূমি পানছড়ি দালাল প্রতিক্রিয়াশীলদের কোন স্থান হতে পারে না।

যে জাতিতে সংগ্রামী বীরের জন্ম নেয়, সে জাতিকে কোনদিন দমানো যায় না। আমাদের পূর্বপুরুষরা বৃটিশদের বিরুদ্ধে এক যুগের বেশি সময় ধরে বীরত্বের সাথে লড়াই করেছিলেন। বীর সেনাপতি রনু খাঁ এই যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়ে ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছেন। এই মহান বীরের মতো বিপুল, সুনীল, লিটন ও রুহিনদের আত্মত্যাগ বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের সংগ্রামী বিপ্লবীদের জন্য সাহস ও প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। অন্যদিকে খুনী ঠ্যাঙাড়ে ও তাদের মদদদাতারা ইতিহাসে চিরকাল ঘৃণার পাত্র হয়ে থাকবে।

শেষে এটা বলা প্রয়োজন, যারা মনে করে খুন, ঠ্যাঙাড়ে সন্ত্রাস করে ইউপিডিএফের নেতৃত্বে পরিচালিত গণআন্দোলন দমন করা যাবে, তারা বোকার স্বর্গে বাস করছেন। চুক্তির পর থেকে আজ পযন্ত আমাদের পার্টির ৩৫৬ জন নেতা কর্মী ও সমর্থককে হত্যা করা হয়েছে, নিষ্ঠুর দমন পীড়ন চালানো হয়েছে ও এখনো হচ্ছে, কিন্তু তারপরও আন্দোলন ধ্বংস করা যায়নি, ভবিষ্যতেও যাবে না। আমরা যে রক্ত দিয়েছি, তার মূল্যে জনগণের অধিকার দিতেই হবে।

রবি শংকর চাকমা

সাধারণ সম্পাদক

ইউপিডিএফ